Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা
PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
MONTHLY
মাসিক
Vol : XV Issue : V, 15th August, 2025. ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

অগস্ট মাসটা দ্রোহের মাস। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও ছিল এখনো আছে। তাইতো ৯ অগস্ট সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আবার পথে নেমেছিল তিলোত্তমার বিচার চেয়ে। চিকিৎসক তরুনীর মৃত্যুর এক বছর পরেও আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। কারণ- আর জি করে খুন-ধর্ষণের পিছনে কারা, জানা গেল না/ কারা তথ্য লোপাট করেছিল, জানা গেল না/ জমা পড়েনি সাপ্লিমেন্টারি চার্জসিট/ মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ত্রাসের রাজত্ব অব্যাহত/ রেফার ব্যবস্থা চলছেই/ রাজ্যস্তরে গ্রিভান্স অ্যান্ড রিড্রেসাল কমিটি গঠন হলেও তেমন পদক্ষেপ নেই/ মেডিক্যাল কাউন্সিলের দুর্নীতির অভিযোগের সুরাহা নেই/ সর্বোপরি, সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতির মন্তব্য সত্বেও অকুস্থলে ভাঙচুরের ঘটনায় এখনো চার্জসিটই হল না। তাইতো রাজপথ ছাড়া যাচ্ছে না।

এই মাসেই রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ হয়েছিল। যিনি শিলাইদহের কাছারিবাড়িতে জমিদার হিসেবে প্রথম এসে পূণ্যাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমানের এমনকি হিন্দু প্রজাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, উঁচু-নিচু আসনের ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে সিউড়িতে এক সভায় বলেছিলেন 'হিন্দু মুসলমানকে যারা কৃত্রিম বেড়া তুলে আলাদা রাখার চেষ্টা করছেন তারা মুসলমানেরও বন্ধু নন, হিন্দুরও নন। 'উদয়ন বাড়িতে গেদু মিঞাকে পাচক হিসেবে নিয়োগ করে তাকে বলেছিলেন, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি, তুই বাঙালি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মই তোর ধর্ম।' 'আমরাও বলি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মই আমাদের ধর্ম।'

এখন তো আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষাই আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলা ভাষা নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তোলা হচ্ছে, অমিত মালব্যরা বলছেন বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষাই নেই। বাংলা মানে শুধু সংস্কৃত শব্দ যে ভাষায় আছে। ফারসি বা আরবি শব্দ থাকলে ওটা বাংলা নয়- বাংলাদেশি। এই অর্ধশিক্ষিত লোকেরা জানে না যে বাংলা ভাষায় আজ ৭০০ বছর ধরে কয়েক হাজার ফারসি- আরবি শব্দ রয়েছে। কিন্তু আমরা তো জানি সংবিধানে অষ্টম তফশিলে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, এমনকি বিভিন্ন অভিধানেও 'বাংলা' কথার অর্থ দেখতে পাওয়া যায় তাই। তাই এসব উদ্ভট কথাবার্তা আমাদের মেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই।

'১৩' এক অশুভ দিন

গৌতম রায়চৌধুরী

বঙ্গ জীবনে '১৩' সত্যিই অশুভ। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ [২৯ জুলাই ১৮৯১] রাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্য বঙ্গসমাজ থেকে ঈশ্বরের প্রস্থান সূচীত করেছিল। ১৮৯১-র জুলাই মাসটি ছিল এক অভিশপ্ত মাস। ২৬-য়ে জুলাই প্রয়াত হয়েছিলেন কৃতী পৃষ্ঠ্যভির প্রাচ্যবিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তিনদিন বাদে বাঙ্গালির ঈশ্বর।

১৪ শ্রাবণ দিনের বেলা ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তিম যাত্রা ও শ্বশানে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় আলোড়ন আমরা পাঁচজনের থেকে শুনব, চারজন কলকাতাবাসী এবং অন্যজন ঢাকা নিবাসী।

প্রথমেই অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন–

> 'এই দিবস (১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮, ২৯শে জুলাই ১৮৯১) রাত্রি একটা পনের মিনিটের পর জ্ঞানরাশির জ্ঞানলোপ পাইয়া দুইটা আঠার মিনিটের সময় তিনি এই অসার সংসার পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে নিজ-ব্যবহৃত পালঙ্কে শয়ান করাইয়া, তাঁহার একমাত্র নারায়ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তাঁহার আদরের জিনিস মেট্রোপলিটান কলেজে কিয়ৎক্ষন রাখিয়া বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পুনরায় স্কন্ধে বহন-পূর্বক নিমতলার ঘাটেই নামাইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বশানে গিয়ে অন্তোস্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।'
>
> [বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, শম্ভুচন্দ্র, পৃ. ১৩৫, চিরায়ত]

শম্ভুচন্দ্র ছাড়া অন্যতম দুই অনুরাগী চন্ডীচরণ ও বিহারীলাল মনে হয় তাঁর শবযাত্রার অনুগামী ছিলেন। তাঁদের বর্ণনার, যা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়, প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ–

> '....ভাগীরথীতেই শ্বশান ক্রোড়ে শায়িত বিদ্যাসাগরকে দেখিবার জন্য যাঁহারা ছুটিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধের পুতুল ভাসাইয়া দিয়া ম্লান মুখে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও শূন্য হৃদয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নীরব কার্যপ্রিয় লোক ছিলেন, আশ্চর্যের বিষর এই যে, তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াকালে অন্য কোন শব সমাগত হয় নাই।'
>
> [বিদ্যাসাগর। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০২০, পৃ. ৩৯৪]
>
> '....মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পুত্র নারায়ণ বাবু বাক্যকুলিত লোচনে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "বাবা, এই তোমার সাধের মেট্রোপলিটান।" ...দেখিতে ক্রমে শ্বশানঘাট অসংখ্য জনসমাগমে পুর্ণ হইল। সকলেই বিদ্যাসাগরকে শেষ দেখিবার জন্য উদগ্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল ।
>
> ....সেই সময় প্রকৃতি প্রকৃতই একটা বিশ্বব্যাপী সৌমগম্ভীর শোকময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছিল।'
>
> [বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। ১৯৮৬। পৃ. ৩৭০]

কলকাতার চতুর্থ জন, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সির কলেজের প্রাক্তনী, বিনয় ঘোষকে [বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, পৃ-]

জানিয়েছিলেন–

'মনে আছে বৈকি! খুব মনে আছে। এখনও মনে হয় গতকালের ঘটনা। সেদিন কলকাতার ছাত্ররা সারাদিন উপবাস করেছিল এবং খালি পায়ে চলেছিল। আর পিতৃবিয়োগ হলে যা হয় আমাদের ছাত্রদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারপর দীর্ঘকাল আমি বেঁচে থাকলাম, অনেক দেশনেতার ও সমাজনেতার মৃত্যু আমি দেখেছি, বেদনাও বোধ করেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে অসহায়ের মতো যে শূন্যতা বোধ করেছিলাম সে দিন, সেরকম আর করিনি।

গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭০) ৮৮ বছর বয়সে ১৯৫৮ সালে মৃত্যুর পুর্বে বঙ্কিমচন্দ্র (৮/৪/১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ (৭/৮/১৯৪১)-সহ আরও অনেকের

মৃত্যুমিছিল প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কুলদাচন্দ ব্রহ্মচারী- তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। ঘটনাস্থল ঢাকার গেন্ডারিয়ার আশ্রম। ঘটনাকাল ১৪ শ্রাবণ, ১৮৯১। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরদিন বেলা ১১টার ধ্যানে বসে তিনি বলেছিলেন,–

'....আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! সোনার রথ , কি শোভা ! ধন্য !! ধন্য !! ....মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চললেন। হরিবোল! হরিবোল!'

বিদ্যাসাগরের ছাত্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে মেডিকেল কলেজে যে ধর্মঘট হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের উদ্যোগেই তার মিমাংসা হয়েছিল। বিজয়কৃষ্ণ অবশ্যই এর পরই সংসার ত্যাগ করেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস দূরে সরিয়ে রেখে আমরা এই সাধকের বর্ণনায় আমরা রোমাঞ্চিত হইতেই পারি।

এক সাধকের উচ্ছাসকে আমাদের বৈজ্ঞানিক মন অস্বীকার করতেই পারে, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। আমরা শেষ করব এক মুসলিম কিশোরির হৃদয়বেদনা দিয়ে–

'করুণা আকর বিদ্যার সাগর
ভারত সুবুদ্ধ জীবিত নাই।
সাদা অশ্রুজলে, মানব সকলে,
শোকের সাগরে ভাসিছে তাই।

[বরিশালের উকিল মৌলবী মহম্মদ ওয়াহেদ সাহেবের কণ্যা শ্রীমতি আক্তজা কেনেচ্ছা খাতুন। 'হিতকারী' পত্রিকা, (২য় ভাগ, ১২ সংখ্যা)। ১৪/০৮/১৮৯১।

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির আকুপাংচার চিকিৎসা

ডাক্তার সন্দীপ সেনগুপ্ত (9883120761)

কিছু দিন আগে এক বিখ্যাত গায়ক পিঠের ব্যথার জন্য আকুপাংচার চিকিৎসা নিতে এলেন। তার চিকিৎসা শুরুর আগে, পিঠে ব্যথা ছাড়া অন্য আর কোনো সমস্যা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলাম। একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন "আর একটা সমস্যা আছে... পায়ের সমস্যা। কিন্তু আকুপাংচার-এ কি তার সুরাহা হবে"? আমি বললাম আপনি বলুন-ই না। তারপর দেখা যাবে, কতোটা কী করা যায়। তখন উনি বললেন, ওঁর পায়ের তলা-টা অবশ হয়ে থাকে। মাটিতে পা-ফেলে হাঁটার সময়, মাটি স্পর্শ হচ্ছে কি না, ঠিকঠাক বুঝতে পারেন না! আমি প্রশ্ন করলাম, ডায়াবেটিস আছে কী? উনি উত্তরে জানালেন, কয়েক বছর আগে পেটের একটা সমস্যার জন্য স্প্লিন-এর অপরেশন করতে হয়েছিল। তারপর থেকে ডায়াবেটিস হয়েছে এবং নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হয়। তা এই গায়ক ভদ্রলোক-এর আকুপাংচার চিকিৎসা করা হলো। এবং আশ্চর্য জনকভাবে দুই-তিন দিন পরই উনি জানালেন যে, পিঠের ব্যথার চেয়েও পায়ের অবশ ভাবটা তাড়াতাড়ি কমছে! সঙ্গে এটাও জানালেন যে, অনেক রকম চিকিৎসা ট্রাই করেও পায়ের ঐ সমস্যাটা কমছিল না। তাই আকুপাংচার করেও কিছু লাভ হবে, এমনটা উনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তবে এখন... হাসি মুখে বললেন "মনে হচ্ছে অনেকটা রিলিভড"!

এই যে পায়ের নীচে অবশ ভাব, এটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে নিউরোপ্যাথি। এটা নানা কারণে হতে পারে। ডায়াবেটিস থেকে হলে তখন একে বলা হয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি। এই সমস্যাটা নিয়ে আরো আলোচনা করার আগে দুটো ছোট্ট তথ্য জানিয়ে রাখি। প্রথমটা হলো যতজন মানুষের ডায়াবেটিস রোগটি হয় তার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের এই নিউরোপ্যাথি হবার সম্ভাবনা থাকে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ভারতে এই মুহূর্তে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির পরিসংখ্যান বেশ উর্ধমুখী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে ডায়াবেটিস হলে নার্ভ-এর সমস্যা দেখা দেয় কেন? আসলে রক্তে সুগার-এর মাত্রা বেড়ে গেলে তা প্রান্তীয় স্নায়ুগুলোকে আক্রমণ করে। আর তার পর নার্ভ ফাইবার বা স্নায়ু তন্তুগুলো আক্রান্ত হয়, পরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। যেহেতু স্নায়ু তন্তুই স্পর্শ অনুভূতিকে মগজ অবধি পৌঁছাতে সাহায্য করে, তাই ওগুলোর ক্ষয় হলে স্পর্শ অনুভব করার ক্ষমতাও কমে যায়। আর স্নায়ু তন্তুর যে শুধু ক্ষয় হয় তাই নয়, পাশাপাশি অনেক সময় রক্তের মধ্যে থাকা অতিরিক্ত চিনির আক্রমণে ওগুলোর প্রদাহও ঘটে। ফলে পায়ের নিচে, হাতের তালুতে জ্বালা করে। অনেক সময় পিন বা কাঁটা ফোটার মতো অনুভূতি হয়।

হাতে-পায়ের জোরও ক্রমশ কমতে থাকে। হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরা খুব অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। দৌড়ের বা তাড়াতাড়ি হাঁটার ক্ষমতাও কমে যায়। অনেকে রাতে ঘুমাতে পারেন না। কারণ পায়ের নীচে একনাগাড়ে জ্বালা করতে থাকে। ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির রোগীরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটার কথা বলেন, সেটা হলো পায়ের নিচে অবশ ভাব। হাঁটার সময় মনে হয় যেন পায়ের নিচে একটা স্পঞ্জ বা রাবারের আস্তরণ রয়েছে! পা যে মাটিকে স্পর্শ করছে এই অনুভূতিটা যেন অনেক দেরিতে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়। হাত আর পায়ের স্পর্শ অনুভূতি কমে যাওয়ার ফলে ঠান্ডা-গরম বোধটাও কমে যায়।

প্রচলিত চিকিৎসায় কিছু মলম, হাল্কা গরম জলে হাত-পা ডুবিয়ে রাখা, হাত-পায়ের চামড়ার যত্ন নেওয়া ইত্যাদি পরামর্শ দেওয়া হয়। এগুলোয় কতোটা উপকার হয় তা ওই রোগীদের জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়!

আমাদের আকুপাংচার চিকিৎসায় এই সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বেশ ভালো ফলাফল পেয়েছি। হাত বা পায়ের অবশ ভাব কমাতে বা জ্বালা কম করতে আকুপাংচার বহু ক্ষেত্রে খুব আশাজনক ফল দিয়েছে। আক্রান্ত হাত বা পায়ের জোর বাড়াতেও আকুপাংচার সাহায্য করে।

কি ভাবে আকুপাংচার চিকিৎসা করা হয় সেটা এখন অনেকেই জানেন। তবু আর একবার সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক। আকুপাংচার চিকিৎসায় শরীরের চামড়ার ওপর অল্প কয়েকটি বিন্দুতে ভীষণ সুক্ষ কিছু সূচ ফোটানো হয়। এই সূচগুলো ফোটানোর আগে উপযুক্তভাবে পরিশোধন করে নেওয়া হয়। আকুপাংচার বিন্দুগুলো অবস্থান করে হাতে-পায়ে, কোমরে-পিঠে, মাথায়-কানে... অর্থাৎ শরীরের সর্বত্র। তার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় অল্প দুই-চারটেকে বেছে নেওয়া হয়। এরপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূচগুলো ঐ বিন্দুগুলোতে ফুটিয়ে মিনিট কুড়ি রেখে দেওয়া হয়। সূচ ফোটাতে গেলে তেমন একটা ব্যথা লাগে না, সেকথা বলাইবাহুল্য। এরপর প্রয়োজন মনে হলে ঐ সূচগুলোর মধ্যেদিয়ে অত্যন্ত মৃদু মাত্রার ইলেক্ট্রিক স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। কখনো কখনো একধরনের পাহাড়ি গাছের পাতার সেঁক দেওয়া হয়, এটিকে বলে মক্সিবাস্চান। তাছাড়া হ্যমারিং, কিউটেনিয়াস স্টিমুলেশন প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়। রোগাক্রান্ত প্রান্তীয় স্নায়ুগুলোকে সুস্থ করার মধ্যেদিয়ে আকুপাংচার এই জাতীয় নিউরোপ্যাথির লক্ষণগুলোকে কমাতে সাহায্য করে। একটু ধৈর্য ধরে চিকিৎসা নিতে পারলে দুরারোগ্য এই সমস্যার সমাধান অনেকটাই সম্ভব।

গৌতম রায়চৌধুরী

জন্ম : ১ এপ্রিল ১৯৫১ ■ মৃত্যু : ১২ অগাস্ট ২০২৫

আমরা গভীর শোকের সঙ্গে জানাই
বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের
সম্পাদক এবং জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর
সাধারণ সম্পাদক গৌতম রায়চৌধুরী
গত ১২ অগাস্ট ২০২৫ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী শিখা রায়চৌধুরী, কন্যা, পুত্র, নাতি-সহ
অগণিত গুণমুগ্ধ সহযোদ্ধাকে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।
গৌতম রায়চৌধুরী এক মৃত্যুহীণ প্রাণ।

বিরহ-সংলাপ

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেসে চলে যায় সন্ধ্যার মেঘমালা
রাধাবিনোদের মন্দিরে ওঠে চাঁদ
নেশা-জড়ানো কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়
ভুলেছি কি যত সমাজের ফরিয়াদ

কোথায় হারায় আমাদের স্বপ্নেরা
বুকের সেতুটা হাওয়ায় খাচ্ছে দোল
মায়ের কান্না-ভেজা আঁচলের গান
ধমনী শিরায় ছড়ানো সুরের বোল

বহুরূপী দল সুরের ডানায় নাচে
নিশানায় স্থির সব হাওয়া-বন্দর
দিগন্তরেখা, ট্রেনলাইন, হারানো মন
চিরক্ষুধাহীন শান্ত ও সুন্দর

সম্পর্কের বুনোট-ছেঁড়া আগুনে
মন্ত্রোচ্চারনে কেঁপে ওঠে সন্ধ্যা
নিচু সংলাপে মগ্ন থাকে যত
সুগন্ধী গোলাপ আর রজনীগন্ধা

কুলো সরা কড়ি পাশাপাশি সব রেখে
পুড়ছে গোটা কলা খই পানপাতা
লুকনো কান্না আর ফোঁপানির নীচে
প্রদীপের নিভুনিভুতেই শুধু মাতা

স্বপ্নভেজা রাতের শেষে তবু
ফুটে থাকে সেই সজল দুটি চোখ
বন্দি মনের বাঁধনছেঁড়া জেদ
রাতশেষে শুধু বিয়োগান্তক শোক...

জীবন

কবিতা দিন্ডা

জীবন এক বহমান স্রোতের ধারা
যা কখনো থামে না,
সুখ দুঃখের খেল এ যে
একজন থাকলে একজন থাকে না।

আলো আঁধারির জীবন এ যে
আশা ভরসার ডেরা,
যতই তুমি চাওগে সুখ,
সুখ আসেনা দুঃখ ছাড়া।

জীবন যুদ্ধে লড়তে হবেই
আছে স্বপ্ন, আছে মায়া
এগিয়ে চলো ধরা দাও,
এ জীবন সোনার ধারা।

অবিচল গতিধারা

তপনকুমার দাস

সংগ্রামে আর্কিন ছিল জীবনের গতি।
আদি-অন্ত ছিল সুদ্ধ গতিশীল ধারা।
কখনো হয়নি শ্লোথ পথ তাঁর সব।
সর্বদা সচল ছিল– ছিল ধ্রুব তারা।
আজও সেই ধারা আছে, ঘর্মাক্ত মিছিল,
ভাঁটা নেই তার কোনো জাগ্রত জীবনে।
বাধা কেউ দিলে পথে বাধে যে লড়াই,
ছেদ নেই পথ-মাঝে সংগ্রামী ভুবনে।
নিরাশা কখনো আসে, আছে দুঃখ-শোক,
তবুও অমোঘ নয় সিদ্ধান্ত অটল।
সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে– পাখির কূজন।
প্রবাহে সর্বদা চলে ধ্রুপদী উজ্জ্বল।
সত্যের নিরিখে চিত্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হীন
অবিচল গতিধারা বলাকা উড্ডিন।
তুমি আজও আছো আমাদের মননে।
তোমাকে খুঁজি সর্বদা সত্যের সন্ধানে।

বৃষ্টির সেই রাত

মালবিকা কর

সময়টা ছিলো শ্রাবণ মাস। শনিবারের বিকালের আকাশটা ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি যেন প্রকৃতিকে ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত করে রেখেছে। ঘন্টাখানেক বৃষ্টি তার তান্ডবলীলা দেখালেও তার শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে লাগল। কর্মব্যস্ত কলকাতায় শনিবারের কাজ শেষ করে সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার এক হই হুল্লোড় পরিস্থিতি। আজ প্রকৃতি প্রতিকূল, তাই বনগাঁ লোকালের সমস্ত যাত্রী তাদের বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে। অটোচালক রহিম আলি মোল্লা তার অটো নিয়ে যখন স্ট্যান্ডে এলো তখন ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যে ছ'টা। শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় দিনভর সে বাড়িতেই ছিল। বেলার দিকে একটু সেদ্ধ ভাত ও বিকেলে চা-মুড়ি খেয়ে সে অটো নিয়ে এসেছে অটোস্ট্যান্ডে। স্ট্যান্ডের কাছে শুধুমাত্র একটি চায়ের দোকান খোলা, দোকানে টিমটিম করে লম্ফের আলো জ্বলছে। সন্ধ্যে সাতটা বেজে যাওয়া সত্ত্বেও একটা প্যাসেঞ্জারও রহিমের কপালে জুটলো না। তাই চা দোকানে গনগনে উনানের আঁচের সামনে শরীরটাকে গরম করতে করতে চায়ের গ্লাস যেন শরীরটাকে একটু স্বস্তি দিল। অন্তত একটি প্যাসেঞ্জার হলেই কোনোরকম তাকে ছেড়ে বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। কারণ তার শরীর আজ যেন সাথ দিচ্ছিলো না। এদিকে আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে লোডশেডিং। আল্লার অশেষ কৃপা! বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে এক ব্যক্তি স্ট্যান্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে গাড়ির সামনে এলেন। ভাঙাচোরা ভারী গলায় বলে উঠলেন– 'আপনি কী ব্যস্ত'?

প্রশ্নটা আমাকে অবাক করলো, সচরাচর এমন অদ্ভূত প্রশ্ন কোনো প্যাসেঞ্জারকে আমি এর আগে করতে শুনিনি। ঘন অন্ধকারে পরিষ্কারভাবে তার মুখটি আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। ব্যাক্তিটি যথেষ্ট লম্বা। গায়ে কালো কোট, মাথায় টুপি। ঘন অন্ধকারে শুধুমাত্র তার অস্পষ্ট দুটি চোখ ও উজ্জ্বল দাঁত আমার চোখে পড়লো। আমি উত্তর দিলাম– 'না আমি ব্যস্ত নই'। আগন্তুক প্রশ্ন করলেন– 'আমাকে একটু ছেড়ে দিতে পারবেন'? জিজ্ঞাসা করলাম কোথায়? তিনি বলে উঠলেন– 'দু-চোখ যেদিকে যায়।' আমার শরীরটা ভীষণই অসুস্থ। কাজেই এধরণের কথায় আমার মাথায় যেন রাগ চড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো যাত্রী আমার লক্ষ্মী, তাই কোনোমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে বললাম– দেখুন বৃষ্টির রাত, রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী প্রায় নেই বললেই চলে। তার মধ্যে আমার শরীরটা ঠিক নেই, কাজেই সঠিক গন্তব্যস্থল না বললে আমার ক্ষেত্রে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বেশি দূর যাওয়া আমার ক্ষেত্রে অসম্ভব। আগন্তুক বলে উঠলেন– 'ভয় নেই, আমি কোনো ক্রিমিনাল নই বা কোনো পাগল ব্যক্তিও নই, অনেকদিন ধরে এই বনগাঁকে দেখিনি। তাই দু'চোখ ভরে দেখতে চাই।' ব্যক্তির

কথা আমার মধ্যে বিরক্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো। বললাম– আপনি পাগলের মতোই কথা বলছেন। কারণ এতো রাতে চারিদিকের প্রকৃতি দেখা সম্ভব নয়, উপরন্তু চারিদিকে লোডশেডিং। ব্যাক্তি উত্তর দিলেন– 'আপনার কাছে যা দিনে স্বাভাবিক আমার কাছে তা রাতে।' ব্যক্তির এই কথা আমার সারা শরীরে যেন শিহরণ জাগালো, আমি আবার বলে উঠলাম– 'আমার শরীর অসুস্থ, কাজেই আমার ও আপনার উভয়ের সময় নষ্ট করবেন না।' কথা শেষ হতে না হতেই আগন্তুক বলে উঠলেন– 'কতো চাই'? বললাম- 'গরীব হতে পারি, অসৎ নই।'

আগন্তুক বললেন রহিম ভাই রাগ কোরো না, আমি জানি তুমি একজন খেটে খাওয়া সৎ অটোচালক। আগন্তুকের মুখে নিজের নামটি শুনে হতচকিত হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম– আপনি চেনেন? আগন্তুক বলে উঠলেন শহরের সৎ মানুষেরা আমার নখদর্পণে। এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করে আগন্তুক বললেন– আপনার অটোয় আমাকে নিয়ে চলুন, দেখুন আপনার অসুস্থতা আমার সাথে গল্প করতে করতে কেটে যাবে। আগন্তুক এও বলেন– আপনার চিন্তা নেই, আপনার যা প্রাপ্য তা অটো থেকে নামার আগেই আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েই যাবো। অটোর পিছনের সিটে বসতেই শুরু হলো– 'দু-চোখ যেদিকে যায়'– শব্দের সার্থক রূপের যাত্রা, অটোতে যেতে যেতে যেই হালদার পাড়া এলো এখন আগন্তুক বলে উঠলেন– মনে পড়ে রহিম এই পাড়ায় স্কুল মাঠে প্রতি বছর পৌষ মাসে মেলা বসতো, যাত্রা হতো আর তুমি ও তোমার বন্ধুরা মেলা ঘুরে যাত্রা দেখে ঢুলু ঢুলু চোখে বাড়ি ফিরে নিজেদের শরীরটাকে বিছানায় ফেলে দিতে? শুনে রহিম পুনরায় প্রশ্ন করে আপনি কে? আগন্তুক প্রশ্ন এড়িয়ে বলে ওঠে– মনে পড়ে রহিম আম চুরির ঘটনা, চুরি করার সময় তুমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলে। তোমার পা ভেঙে ছিলো। একথা শুনে আগন্তুকের পরিচয় জানার জন্য রহিমের কৌতুহল আরও বেড়ে গেল। সে জানার চেষ্টা করলো তার বাড়ি কোথায়। আগন্তুককে প্রশ্ন করলে সে বলে– 'আমি আপন ভোলা মানুষ, আমি যে সময় যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি, যাদের সঙ্গে যখন কথা বলি তখনই তারা আমার প্রতিবেশী, আমার পরম আত্মীয়।' এইসব কথোপকথন যেন রহিমের কৌতুহল বাড়িয়ে দিল তেমনি অসুস্থতার মাঝে এক অপরিচিত মানুষের সঙ্গে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন তার শরীরে যেন এক সুস্থতার বার্তা বহন করতে লাগল।

অমাবস্যার অন্ধকারে অটোতে এক অজানা অভিযান যেন দু'জনের মধ্যে সুখকর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। অটো এবার এসে পৌঁছাল মসজিদ পাড়ায়। আগন্তুক বললেন রহিমকে 'তুমি অনেক অভাব অনটনের মধ্যে আছো ঠিকই কিন্তু আগে যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে, এখন কি সেই অভ্যাস ভুলে যেতে বসেছ?' রহিম অবাক হয়ে বললো– আপনি এত কিছু জানলেন কী করে? আগন্তুক বলে ওঠে– শুধু জেনে রাখো বনগাঁর সমস্ত সৎ লোকের হিসাব আমার নখদর্পণে। এবার আগন্তুকের সমন্ধে জানতে আগ্রহী হলো রহিম। রহিমের আগ্রহ দেখে আগন্তুক বলে আমার পরিবার বনগাঁয় থাকে। বাবা আছেন, মা আছেন, সন্তান ও স্ত্রী আছেন। রহিম প্রশ্ন করলো– তাহলে আপনাকে এই চত্বরে

দেখি না কেন? আগন্তুক জানালেন তিনি এমন জায়গায় থাকেন যেখানে থেকে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি নেই। দূরে থেকে তাদের মঙ্গল চাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা, পরিবার ত্যাগ করেছে আমাকে। শুনে রহিমের দুঃখ হল। সে বললো– আমার বাড়িতে যেতে পারেন, থাকার একটা ছোটো কুঁড়ে ঘর আছে। আল্লার কৃপায় চলে যাবে। আগন্তুক বলে– 'না ভাই' কারো ঘরে থাকার কপাল আমার নেই। যে আলো তোমাদের ঘুম ভাঙায় সেই আলো আমায় ঘুম পাড়ায়। ঘন অন্ধকার যেন আমার কাছে প্রভাতে পাখির কলবর। মনে পড়ে রহিম দু'জনে মাছ ধরতে যেতাম। তোমার আব্বা, আম্মি দেশের বাড়ি গেলে দু'জনে তোমার বাড়িতে থাকতাম।' রহিমের সারা শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার মনে পড়ে যায় ছোট্ট বেলার বন্ধু ফিরদৌসের কথা, এবার অটো থামিয়ে মনে পড়ল আজ থেকে আটমাস আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া একি সেই ফিরদৌস। পিছনে তাকিয়ে দেখলো সিট খালি। আগন্তুক নেই। সারা গা ঘেমে যেন স্নান হয়ে গেছে। অটো থেকে নেমে পায়ের সামনে দেখলো একটি চিঠির খাম। খামের মধ্যে একটা পাঁচশো টাকার নোট আর একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা– রহিম, অনেক দিন বনগাঁর বনবাঁদড়, হালদার পাড়ার মাঠ, মসজিদ পাড়া দেখিনি তাই দেখার ইচ্ছা হল, সব থেকে বড় কথা শৈশবের স্মৃতি আজ তোকে পেয়ে পূর্ণ হল।

P.R.C. জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন
পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - মঙ্গলবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in